জীবনমুখী গান প্রসঙ্গে

গোপালচন্দ্র কর্মকার

জীবনের কথা নিয়েই তো সুরে ছন্দের গানের অভিব্যক্তি, জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি - কান্না, আনন্দ - বেদনা, আশা - নিরাশা, মিলন - বিরহ প্রভৃতি সব পরস্পর বিরোধী হৃদয়বৃত্তি, অনুভূতি, আবেগ, মনন, চিন্তন নিয়েই তো গানের কলি বাঁধা হয় ভাষার অলংকারে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের সব ঘটনা প্রসূত ভাব নিয়েই তো কবি গায়ক, সুরকার শিল্পী গান বাঁধেন, সুর দেন, কণ্ঠে তার অভিব্যক্তি ঘটান, তাই ইংরেজ কবি শেলী বলেছিলেন, 'Our Sweetest songs are those that tell of saddest thought.' তাই সব গানই জীবনমুখী গান।

বৈদিকযুগে স্তোত্রপাঠ যাগযজ্ঞ করা হতো দুতিনটি স্বর সহযোগে। সেই 'আরাধনা সঙ্গীতে' মানবের কল্যাণ কামনা করা হতো। সেও ছিল জীবনমুখী গান। মানুষের মুখনিসৃত ভাষাই তো জীবনকে জড়িয়ে নিয়ে। তাই যে কোনো ভাষাকে সুর দিলেই তো তার মধ্যে জীবনমুখীতা দেখা যায়। তাই সবগানই জীবনমুখী গান।

সব দেশের সব জাতীয় সঙ্গীত তো জীবনমুখী গানের মূর্ত প্রতীক। শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, দেশাত্মবোধক গান, গজল, ঠুংরী, প্রেমসঙ্গীত, মগ্ন হয়ে, কখনও জীবনের দৈনন্দিন কার্যসূচীকে লিপিবদ্ধ করে, কখনও মানুষের সূক্ষ্ম চিত্ত বৃত্তিগুলিকে থরে বিথরে ভাষার অলংকারে সাজিয়েই তো জীবনমুখী গান রচিত হয়। তাই জীবন মুখীগান নতুন কিছু নয়।

অতি আধুনিক সঙ্গীত সমাজে যে জীবন মুখীগানের প্রচল হয়েছে তার মধ্যে আহামরি কিছু না থাকলেও নতুনত্ব আছে। প্রথমেই বলি, 'জীবনমুখীগান' নামকরনটা একেবারে নতুন, যদিও ওর ভেতরের কিছু জিনিস পুরনো। 'Old wine in a new bottle' তবুও বলবো, এর মধ্যে আরো কিছু নতুনত্ব আছে। আবাল বৃদ্ধ বনিতার দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটি কাজ, জীবনসমস্যা, তার সমাধান, বিপদ - আপদ, মুশকিল আসান, শিশুর খেলা, ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা, পড়ার ফাঁকি, ফাঁকি দিয়ে পাশ, পাশ করেও বেকারত্ব, বেকারত্বের প্রকোপে জীবন যন্ত্রনা, কলেজের প্রেম, ফুটপাতের ভিখারী, বারের মদ্যপান বড়লোকী চাল, মাতালের বিড়ি সিগারেট মদ, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীর ভালো ও খারাপ দিকের ব্যঞ্জনা, খোঁচা, যুগযন্ত্রনা, অনাগত ভবিষ্যতের আতঙ্ক নিয়ে মানব সমাজের জড়োসড়ো ভীতিকম্পিত জীবন চর্যাও, আরো কতশত ক্ষোভ রাগ ব্যথা বেদনার বিস্ফোরণ —এই সব নিয়ে জীবনমুখীগানের ভাষায় অবয়ব রচিত হয়ে চলেছে। এটা নতুন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাণ খুলে দুহাত বাড়িয়ে আকাশপানে চেয়ে হৃদয়ের কথাকে নীলিমায় ভাসিয়ে দেওয়া। এটা অভূতপূর্ব অভিনব।

কিন্তু, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক প্রাকৃতিক অবস্থান ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রসূত যে সঙ্গীতধারা ভারতবর্ষীয় ঢঙে এদেশের মানুষের মন, নাড়ীর স্পন্দন, হৃদয়বৃত্তি, মনন, চিন্তন, উপলব্ধি সর্বোপরি দেশীয় সাংস্কৃতিক সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করে এসেছে, সেখানে এই জীবনের গানের প্রকাশ বৈশিষ্ট্য কতটা আন্তরিকভাবে ভালোবাসার সম্পদ হিসাবে গ্রহণযোগ্য ! শিশু, কিশোর - কিশোরী, যুবক - যুবতীরা এই গানের উন্মাদনায় মেতেছেন এটা বাস্তব সত্য। কিন্তু বোদ্ধা শ্রোতা, প্রথমশ্রেণীর সঙ্গীত রসিকগনের মন কি এই জীবনমুখী গানের দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ হতে পেরেছে? এর উত্তর এক কথায়, না। এই নেতিবাচক উত্তরটা চতুর্দিক থেকে ভেসে আসছে কেন?

জীবনমুখীগানের মাননীয় প্রতিভাবান প্রবক্তাগণ আমাকে মোটেই পুরানোপন্থী, গোঁড়া নিন্দুক, ঈর্ষাপরায়ন ভাববেন না। আমি বাস্তব অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টার উত্থাপন করলাম। আমাকে অনর্থক সৃষ্টিকারী সমালোচক ভাববেন না। এই গানের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সমগ্র জনগনের পছন্দ অপছন্দের ও নানা প্রকার মন্তব্যের ভিত্তিতে নিজের প্রশ্নবানের মুখে আমি নিজেই পড়েছি আর ভাবছি যে, কোথাও কি এমন কিছু ঘাটতি আছে যা ভবিষ্যতে এর সঙ্গীত ধারার ভিত্তিকে টলিয়ে দিতে পারে।

অনুকরণ প্রিয়তা বাঙগালীর একটা উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দুশো বছর ধরে ইংরেজদের বুটের গুঁতো আর চাবুক খেয়ে খেয়ে ভুল ইংরেজি বলতে বলতে, মাতৃভাষাকে এলোমেলো করে বলতে বলতে, ফুলপ্যান্ট সার্ট, নেকটাই পরতে পরতে, মদ বিড়ি সিগারেট খেতে খেতে আজও আমরা বাঙালীয়ানাকে হারাইনি। দেশীয় ঐতিহ্যকে আমরা একেবারে ভুলে যাইনি— এটাই আমাদের রক্ষা কবচ।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি ভাবছি যে জীবনমুখীগান গাইতে গাইতে আমরা কি সত্যি সত্যি দেশীয় ঐতিহ্যকে একেবারে ভুলে গেছি।

পাশ্চাত্য দেশীয় সঙ্গীতকার শিল্পীগণ কিন্তু তাঁদের দেশীয় ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দেন নি। তাঁরা ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। কিন্তু দরবারীকানাড়া, বাগেশ্রী, ইমন, মালকোষ ভৈরবীকে তাঁদের সঙ্গীত ধারার আনাচে কানাচে একটু আধটু স্থান প্রদান করলেও হয়তো করেছেন কিন্তু নিজেদের দেশীয় ঐতিহ্যকে ত্যাগ করেন নি। তাঁরা গীটার কাঁধে লাফালাফি করেন, স্টেজে কুঁদোকুঁদি করেন এটা তাঁদের ঐতিহ্যগত বিবর্তনের অনুসারী সঙ্গীতধারা।

আসুন আমরা একটু নিজেদের গায়ে হাত দিয়ে দেখি। আত্মসমালোচনা মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দেয়। ওস্তাদ আমীর খাঁর কথা 'আপনা সংশোধন আপ্ বনাও।

জীবনমুখীগানের আসরে আমরা আমাদের ঐতিহ্যগত নাড়ীর স্পন্দন জাগানো কোনো সঙ্গীতালংকার, গীত - বাদ্য - নৃত্য রীতিকে অনুসরণ করছি কি? আমাদের সেই প্রবণতা আছে কি? যদিও থাকে, তাতে কতটা গুরুত্ব দিয়ে

মঞ্চে উপস্থাপনা করি তা এখনই ভাববার সময় এসেছে।

আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসার যে সুর ভারতবর্ষ তথা বাংলার মাঠে ঘাটে লোকসংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে, যা বাঙ্গালীর হৃদয়কে সহজেই বিগলিত করতে পারে তাকে কি আমরা জীবনমুখীগানে গুরুত্ব দিয়ে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছি? এ ছাড়া ভারতীয় সঙ্গীতের মূলগত বৈশিষ্ট্যটি যে মহামূল্যবান খনির ন্যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিরাজিত সেই রাগরাগিনীর চেহারাকে আমরা এই গানের মধ্যে কোনও স্থান দেবার প্রয়োজন অনুভব করিনি? যদি রাগ রাগিনীকে এই গানে স্থান দেওয়া হয় তাহলে ফলটা কি হয় দেখা যাক না। জীবনমুখীগান তো এখন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পরীক্ষা করে দেখাই যাক না। এসব কথা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে আমরা যদি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথা অনুসারে—

''আমরা বিলিতি কায়দায় হাসি

বিলিতি কায়দায় নাচি

বিলিতি কায়দায় ঠ্যাং ফাঁক করে

সিগারেট খেতে ভালোবাসি। —এমন ধরনের অনুকরণ প্রিয়তার নেশায় মত্ত হই তাহলে আমাদের এই সঙ্গীত ধারা কি লাইন ছুট হয়ে যতে পারে। এটা ভাববার দরকার ছিল অনেক আগে, তবুও আজ ভাবতে ক্ষতি কি?

মুম্বাই ছায়াছবিতে কিন্তু বারের মদ্যপানের দৃশ্যের গানে ও নাচে ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রয়োগ করা হয় প্রত্যক্ষভাবে। ওখানকার ছায়াছবি, দূরদর্শনের প্রতিবেদন, বেতারের প্রচারে স্থানীয় লোকসংস্কৃতির সুর, নৃত্য বাদন পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই লোকসংস্কৃতির সুর এমনই যা মানুষের হৃদয়দেশে সুড়সুড়ি জাগায় অতি সহজে। মুম্বাইতে একটা সাধারণ গানকে লোকসংস্কৃতির বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতায়, নৃত্যের অলংকরনে ও রাগ সঙ্গীতের অবলেপনে অনবদ্য রূপ দেওয় হয়। বহুল প্রচলিত ভূপালী রাগের সা থেকে পা পর্যন্ত স্বর ব্যবহার করে একটা গোটা গানকে এমনভাবে লোকনৃত্যের মাধ্যমে ওঁরা পর্দায় প্রদর্শন করেন যে আবালবৃদ্ধনিতা জাতিধর্ম নির্বিশেষে, দেশী বিদেশী নির্বিশেষে সকলেই মুন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। সারা ভারতবর্ষকে হিন্দিগান কেমন মাতিয়ে রেখেছে? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে মুম্বই যেতে হবে— শিখতে হবে। হিন্দিগানে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের সুরের ছাঁচের ওপর পাশ্চাত্য সঙ্গীত রীতির ঢংকে প্রয়োগ করা হয় বহু সাধনা, মেহনত, মনন, চিন্তনের মাধ্যমে। মুম্বই ছায়াছবির এবং সঙ্গীতজগতের প্রাণপুরুষগণ জানেন ভারতীয়গণকে হিন্দি ছবিতে মাতিয়ে রাখতে গেলে ভারতীয় সঙ্গীত ঘরানাকে মূলভিত্তি করে তার ওপর দেশি বিদেশী নানা ধরনের চেহারার নাচন কোঁদন আনতে হবে। অর্থাৎ, ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল নাড়ীর স্পন্দনটি যেন প্রতিটি গানের মধ্যে সূর্যালোকের মতো বিরাজ করে। এই চাবিকাঠিটা সর্বজন বিদিত। তবুও তাঁরা সেই পথে চলবেন না। তাঁরা সর্বদা কায়দা কৌশল প্রদর্শন করতে গেলে পায়ের তলায় মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তা করতে হয় এটা তারা সজ্ঞানে জেনেও মাটিটাকে চেনা, জানার চেষ্টা করেননি। তাই বাংলা সঙ্গীতের নবশাখা জীবনমুখী গানের গঠন ও সৃষ্টিশীলতার মধ্যে এসব চিন্তাধারা কিছুই নেই। কি মালমশলা প্রয়োগ করতে হবে তার সঠিক চিন্তাটাই করা হয়নি। তাই জীবনমুখীগানের এই শৈশবাবস্থায় এই প্রকার গঠনমূলক চিন্তার আবশ্যকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি সঙ্গীত চর্চা করি, শিক্ষার্থী মাত্র। তাই শিক্ষার্থীর মন নিয়ে চর্চা - মনন - গবেষণা সর্বোপরি উপলব্ধির মন নিয়ে আমি বলতে চাই যে, বাংলার জীবনমুখীগানের মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। এজন্য একনিষ্ঠ সাধনার দরকার। রাগরাগিনী অনেকেই জানেন কিন্তু জীবনমুখীগানের ঘরানা বজায় রেখে তাকে প্রয়োগ করতে হবে। জীবনমুখীগানের ধারক বাহকদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী আছে যাঁরা চিরন্তন শিল্পীরূপে অমর হয়ে থাকার ক্ষমতা রাখেন। ঠ্যাং ফাঁক করে গীটার হাতে মঞ্চে কুঁদোকুঁদি করে বাচ্ছা ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতীদের মনকে কিছুদিনের জন্য মোহিত করা যেতে পারে কিন্তু ঐ যুবকযুবতীরা প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করে ভিন্ন রুচি সম্পন্ন হয়ে পড়বেন।

আপনারা এখন এই সঙ্গীতধারার শৈশবে বিরাজ করেছেন। বাংলাসঙ্গীতে এক চিরজাগরুক করে প্রথম শ্রেণীর লঘুসঙ্গীত ধারায় পরিণত করতে আপনারা আগ্রহী হবার চেষ্টা করুন। তারজন্য নিজের ঘরের মূল্যবান সম্পদকে বিসর্জন দিলে কালের বিবর্তনে অচিরেই নিজেদের বিসর্জিত হতে হবে।

জীবনমুখীগানে জীবনের ভাষাচিত্র যেমনই থাকুক, যন্ত্রানুষঙ্গ ভারতীয় ধাঁচে ব্যবহার করুন। সঙ্গীত কানে শোনার জন্য। আসরে দাপাদাপি, গীটার কাঁধে বা বগলে নিয়ে ছুটোছুটি কণ্ঠ শিরা উত্থিত করে ঊর্দ্ধমুখে চিৎকার রব ভবিষ্যতে কেউ শনেও শুনবেন না আর দেখেও দেখবেন না। ভাবতে আরম্ভ করুন চোখ দিয়ে দেখবার জন্য সঙ্গীত নয়। একজন অন্ধমানুষ সঙ্গীত শিল্পী বা সঙ্গীত রসিক হতে পারেন। এ নমুনা সমাজে বহু ছিল আজও আছে এবং থাকবেও। একজন বধির সঙ্গীতরসিক হতে পারেন না। সেই বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ বিটেভেন কিংবদন্তী ব্যতিক্রমী চরিত্র।

জীবনমুখী গানের ধারা আরো শতমুখী হোক নবরূপে, নবকলেবরে একেই শৈশবেই প্রতিষ্ঠিত করুন স্বদেশীয় ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে।

এই প্রতিবেদনকে অযাচিত উপদেশ বর্ষণ বা পন্ডিতি প্রসূত পাকামি প্রদর্শন মনে না করাই ভালো। এই সঙ্গীতধারাকে বাংলা সঙ্গীত - সংস্কৃতির ভূমিতে দৃঢ়মূল করবার আশায় এই সানুনয় প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে হয়তো জীবনমুখীগানের অনেক শিল্পী, রসিক ভক্ত বিযোদগার করবেন নানা যুক্তি প্রদর্শন করে, তাতে লাভ কিছু হবে না। কারণ, এই প্রতিবেদক বর্তমানে জীবনমুখী গান নামক সঙ্গীত ধারাটির এক জন বিশেষ শুভার্থী।

সৃষ্টিসন্ধান